ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 65- 71
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.180

মুহূর্তে বদলে যায় নারীর জীবন: মহাশ্বেতা দেবীর 'প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে' উপন্যাস

অনসূয়া কুণ্ডু, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 10.09.2025; Accepted: 12.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Almost all women writers have spoken out about crimes committed against women. But before 20th century they mostly talked about love, marriage, widowhood and domestic violence. After enduring domestic violence for a long time, women also preferred to remain silent and they become almost like domestic animals. In cases of sexual violence against them, the victims kept quiet for fear of losing their honor.

From the second half of the 20th century, the level of sexual assault on women increased many times due to the movement out of the house. Mahasweta Devi's work is a powerful exploration of social justice, women's rights, and the struggles of marginalized communities. She sheds light on the harsh realities of domestic violence, sexual assault and other forms of violence faced by women. The novel Every Fifty-Four Minutes is a shining example of how a woman's life changes in an instant, centered around a rape.

Keywords: widowhood, Domestic violence, Sexual violence, Victims, Social justice, Rape

বিশ শতকের আগে পর্যন্ত নারীদের কোনও নিজস্ব উচ্চারণ না থাকায় পৃথক ও সমান্তরাল সত্তা হিসেবে তারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে স্বীকৃতি পায়নি। তাদের আপন স্বরন্যাস খুঁজে নেওয়ার জন্যে দুরূহতম সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে। অপরদিকে পিতৃতান্ত্রিক যুক্তিশৃঙ্খলায় অভ্যস্ত পুরুষ নারীর প্রতি নৃশংস অত্যাচার করার ছাড়পত্র লাভ করেছে। সিমন দ্য বোভোয়া-র মতে মানুষের ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির জন্যে সত্তার দ্বিবিধ প্রকাশের অন্তর্বর্তী ব্যবধান বিশ্লেষণ খুবই কার্যকরী। তিনি দেখিয়েছেন শরীর মূলত; নিয়ত উপস্থিত ও বিষয়গত অস্তিত্ব। কারণ একে—দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়, শোনা যায়, স্বাদ ও ঘ্রাণ নেওয়া যায়। এক কথায়, দেহ হল পর্যবেক্ষিত বিপরীতক্রমে পর্যবেক্ষক সত্তা দেখে, শোনে, স্পর্শ করে, ঘ্রাণ নেয় ও স্বাদ নেয়। অর্থাৎ ঐ সত্তা নিজে পর্যবেক্ষণের বিষয় নয়। নারীর শারীরিক অভিজ্ঞতা নানা অনুপুঙ্খের মধ্যে দিয়ে নিজের অস্তিত্ব-চেতনার বিশিষ্ট একটি ধারণাকে প্রকাশ করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া জুড়ে থাকে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের প্রেক্ষিত। অজস্র ঘাত প্রতিঘাতে পূর্ণ সমাজে বিষয় ও বিষয়ীর সন্ধান যেমন সহজে নিষ্পন্ন হয় না, তেমনই নারীর সঙ্গে সহযোগী বা অসহযোগী সম্পর্ক-বিন্যাসও বিচিত্র জটিলতার জন্ম দেয়। এই জটিলতার সর্বোচ্চ নেতিবাচক পরিণতি নারীর প্রতি ধর্ষণ। এই নৃশংস কর্মকাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর আইনানুগভাবে ধর্ষণ প্রমাণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি থাকলেও নারীরা কখনোই সুবিচার পায় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্ষকের সাজা হলেও, সমাজ নারীকে হীন চোখে দেখে। ধর্ষিতা নারীকে কখনোই আগের মতো সামাজিক ও গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে দেখা হয় না। নারীত্বের এই অবদমনের চিত্র সব দেশে সব কালে সমান।

বিশ শতকের সাতের দশকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষে নবচেতনার জাগরণ ঘটেছিল। রাজতন্ত্রের অবসানে গণতন্ত্রের অভ্যুত্থান হয়েছিল এবং সময়ের দাবী মেনে জীবনচেতনার বিবর্তন হয়েছিল। এই সময়ের গণ-সচেতন মহিলা কথাশিল্পী রূপে মহাশ্বেতা দেবীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁর লেখায় নারী চরিত্রেরা হয়ে উঠেছে সমাজ

নির্ধারিত বাস্তব সত্য। তৃষ্ণার্ত হরিণ শিশু যেমন জল খাওয়ার আগে মৃত্যু সম্পর্কে অসচেতন থাকে, তেমনই ভাবে নারীদের জীবনেও হঠাৎ করে বিপদ আসে। মুহূর্তে বদলে যায় তাদের জীবনের অভিমুখ। সুদূর অতীতে কবির ভাষায় রূপকার্থে নারীর দেহ-স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> “অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।”[১]

আর আধুনিক কালের একজন জনপ্রিয় নারী সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন বলেছেন—

> “নারী কি জানে রূপ আসলে
> রূপের নীচে তৈরি করে
> অন্ধকার কূপ!”[২]

আসলে মনু কথিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা কেবল ভোগের উপাদান মাত্র। মনু মনে করেন— জন্মে যৌবনে বার্ধক্যে নারীরা পুরুষের অধীন। মনুসংহিতায় নারীর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে বলা হয়েছে—

> “পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ।
> এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্যাদুভে কুলে।।”[৩]

অর্থাৎ স্ত্রীলোক কখনও পিতা, স্বামী কিংবা পুত্রের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না; কারণ স্ত্রীলোক এদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে পিতৃকুল ও পতিকুল—উভয় কুলকেই কলঙ্কিত করে তোলে। সেই ভাবনার প্রতিফলন প্রতিনিয়ত এই সমাজে ঘটতে দেখা যায়। নারীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অন্যায়গুলির সুবিচারের জন্য নানা ধরনের আইনের ধারা খাতায় কলমে লেখা থাকলেও বাস্তবে তা কার্যকরী রূপ পায় না। একজন নারীর জীবন মুহূর্তেই পুরুষতন্ত্রের ষড়যন্ত্রে অন্ধকারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাকে পুনরায় আলোয় ফিরিয়ে আনার জন্য আইনের অনুশাসনের থেকেও জরুরি পার্শ্ববর্তী মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন। নারীর জীবন কলঙ্কিত হওয়ার নেপথ্যে ধাপে ধাপে যে বিষয়গুলি দায়ী, সেগুলি হল—

ক. প্রেমের ফাঁদে পড়ে একজন পুরুষের ভালোবাসার জালে জড়িয়ে পড়া।
খ. কারও দ্বারা ভয় পেয়ে ক্রমাগত ব্ল্যাকমেলিং-এর শিকার হওয়া।
গ. ট্রাফিকিং হওয়া বা পাচার হয়ে যাওয়া।
ঘ. গার্হস্থ্য হিংসার কবলে পড়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া কিংবা চাকরি ছেড়ে দেওয়া।
ঙ. জোর করে, ফুসলিয়ে অথবা কোন মাদকদ্রব্য মিশিয়ে আবেশাচ্ছন্ন করে নারীকে শ্লীলতাতাহানি করা।
চ. আচমকা বা অতর্কিতে নারীকে তুলে নিয়ে গিয়ে বা ঘরে ঢুকে নারীকে ধর্ষণ করা।

প্রতিটি ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী সাজার বর্ণনা সাংবিধানিক বিচার ব্যবস্থায় থাকলেও নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত হওয়া প্রত্যেকটি ঘটনাই অতর্কিতে ঘটে। একজন নারী যখন বুঝতে পারে, তখন তার আর কিছুই করার থাকে না। ভোগ লালসায় মত্ত পেশী-শক্তিতে উর্বর পুরুষেরা নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে। যে-কোনও ধর্ষিতা নারীর শরীরে প্রবল আঘাতের চিহ্ন দগদগে ক্ষতের মতো ফুটে থাকলেও; ধর্ষণ প্রমাণ করার ক্ষমতা বিচার ব্যবস্থার হাতে থাকে না। নারীদের জন্য এই অচলাবস্থা কিছু আইনি প্রতিরক্ষা পেলেও শেষ রক্ষা হয় না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনেক আইন ও আইনের বিভিন্ন ধারার বদল করা হচ্ছে নারীদের আত্মমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে। অনৈতিক পাচার (রোধ) আইন ১৯৫৬, যৌতুক প্রতিরোধ আইন ১৯৬১, নারীদের নিয়ে অশ্লীল বিবৃতি (প্রতিরোধ) আইন ১৯৮৬, সতীদাহ প্রথা রোধ ১৯৮৭, গৃহহিংসা/পারিবারিক হিংসা থেকে নারী সুরক্ষা আইন ২০০5 ইত্যাদি। এই প্রকার কয়েকটি আইনের ধারা এখানে উল্লেখ করা হল—

৩০৪ বি ধারা. যৌতুক হত্যা:

যেখানে বিয়ের সাতবছরের ভেতরে আগুনে পুড়ে অথবা গুরুতর আহত হয়ে অথবা অন্যান্য কারণে স্ত্রীর মৃত্যু হলে এবং মৃত্যুর কিছুদিন আগে তার স্বামী অথবা স্বামীর অন্য কোনো আত্মীয়ের দ্বারা নির্যাতিত, অথবা যৌতুক দাবির কোনো সংযোগ পাওয়া গেলে সেই মৃত্যুকে ‘যৌতুক মৃত্যু’ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তার স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় এই মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকবে। যে কেউ যৌতুক হত্যা সংঘটিত করবে তার সাতবছরের অধিক সশ্রম কারাদণ্ড হবে অথবা সেই শাস্তি বেড়ে যাবজ্জীবন হতেও পারে। হত্যার প্রচেষ্টাতেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনধিক দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং অর্থরাশি জরিমানাও হতে পারে।

৩৫৪. ধারায় নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে হামলা বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ:

এই ধারা যৌন নিগ্রহের অপরাধের মধ্যে পড়তে পারে। এই অপরাধে অভিযুক্তের সশ্রম কারাদণ্ডের সময়কাল তিনবছর পর্যন্ত অথবা জরিমানা, কিংবা দু'টোই হতে পারে।

৩৫৪ বি. ধারায় নিগ্রহ অথবা দুষ্কার্য বলপ্রয়োগ করে নারীকে অসম্মান:

বলপ্রয়োগ করে নারীকে অসম্মান করার অভিপ্রায় কোনো পুরুষ যে নিগ্রহ করেছে অথবা অন্যায় বলপ্রয়োগ করেছে কোনো নারীর উপর অথবা অসম্মান করার অভিপ্রায়ে এমন অসৎ কার্য, নগ্ন, বিবস্ত্র হতে বাধ্য করেছে, তার জন্য ন্যূনতম তিন বছরের কারাদণ্ড, সেটি সাত বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং জরিমানাও ধার্য হতে পারে।

৩৫৪ সি. ধারায় ঈক্ষণকর্ম/ যৌন দৃশ্যকামী অভিপ্রায়:

নারী যখন একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তে থাকে যেখানে নারীটি সাধারণত আশা করে কেউ তাকে লক্ষ করছে না। তখন যদি কেউ লুকিয়ে লক্ষ করে, বা ছবি তোলে, বা ছবি তুলে তৃতীয় ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় অথবা সরাসরি কিংবা বৈদ্যুতিন (সামাজিক) মাধ্যমে দেয়, তাহলে অপরাধের কারাদণ্ড তিনবছর থেকে সাত বছর হতে পারে এবং জরিমানাও ধার্য হতে পারে।

৩৫৪ ডি. ধারায় গোপনে অনুসরণ করা:

যে-কোনও ব্যক্তি একজন মহিলাকে অনুসরণ করে বা এরকম মহিলার দ্বারা বিরক্তি প্রকাশের স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করে বা কোনো মহিলার আন্তর্জাল, ইমেল বা অন্য কোনো মাধ্যমের বৈদ্যুতিন ব্যবহার দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে, তবে শাস্তি ভোগ করতে হবে যা তিন বছর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে বা জরিমানাসহ বা উভয়ই হতে পারে।

৩৬৬ এ ধারা. অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে সংগ্রহ করা:

যদি কোনও অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের কম বয়স) নারীকে কোনও উপায়ে ভুলিয়ে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় অথবা আপত্তিকর এমন কিছু করতে বলা হয়। যার উদ্দেশ্য সেই নারীকে বল প্রয়োগ করে অথবা ফুসলিয়ে কারোর সঙ্গে অবৈধ যৌন সংসর্গে লিপ্ত করা অথবা তার সম্ভাবনা রাখা হয়। তাহলে যে ব্যক্তি এর জন্য দায়ী তার দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। সেইসঙ্গে জরিমানাও ধার্য করা হতে পারে।

৩৬৬ বি ধারা বিদেশ থেকে নারী আমদানি করা:

যদি বিদেশ থেকে (বা জম্মু ও কাশ্মীর থেকে) একুশ বছরের কম বয়সি কোনও নারীকে আমদানি করা হয় এই উদ্দেশ্যে যে তাকে অবৈধ যৌনসংসর্গে লিপ্ত করানো হবে বা তার সম্ভাবনা থাকবে, তাহলে সেই ব্যক্তির দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। সেইসঙ্গে জরিমানাও ধার্য করা হতে পারে।

৩৬৭ ধারায় গুরুতর আহত, দাসত্ব ইত্যাদির জন্য ব্যক্তিকে অপহরণ করা:

পরাধীন করা, অসহায় ঝুঁকিতে ফেলা, গুরুতর আহত করা, দাসত্বের শিকার করা, অপ্রকৃতস্থ লালসার শিকার করা হলে দশ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে এবং জরিমানা রাশিও ধার্য হতে পারে।

৩৬৮ ধারায় অন্যায়ভাবে লুকিয়ে রাখা বা কারাগারে রাখা:

যে-কোনও ব্যক্তিকে অপহরণ করা হয়েছে এইরকম ব্যক্তিকে যদি অন্যায়ভাবে গোপন করে বা আবদ্ধ করে রাখে তবে একই অভিসন্ধিতে তাকে একইভাবে শাস্তি দেওয়া হবে।

৪৯৮ এ. ধারায় স্বামী অথবা স্বামীর নিকট আত্মীয়ের দ্বারা মহিলার নৃশংস হেনস্তা:

যে ব্যক্তি, স্বামী হয়ে অথবা একজন স্ত্রীলোকের স্বামীর আত্মীয় হয়ে, এই মহিলার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, তার কারাদণ্ড বেড়ে তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং জরিমানাও ধার্য করা হতে পারে।

৫০৯ ধারায় শব্দ, অঙ্গভঙ্গি বা কার্য কোনো মহিলার শ্লীলতার অবমাননা করার উদ্দেশ্যে:

যে কেউ, যে-কোনও মহিলার শ্লীলতাহানি করতে চায়, যে-কোনও শব্দ উচ্চারণ করে, যে-কোনও শব্দ (সাউন্ড) বা অঙ্গভঙ্গি দেখানোর মাধ্যমে বা কোনও জিনিস দেখানোর মাধ্যমে শব্দটি শোনা যায় কিংবা এই জাতীয় অঙ্গভঙ্গি বা

জিনিস মহিলার দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসে কিংবা এই জাতীয় ব্যবহার মহিলার ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করে, তবে সাধারণ কারাদণ্ড যা তিন বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং জরিমানাও ধার্য হতে পারে।

৫০৯ এ. ধারায় আত্মীয় দ্বারা যৌন হয়রানি:

যে ব্যক্তি রক্ত সম্পর্কিত, দত্তক গ্রহণ বা বিয়ের মাধ্যমে কোনও মহিলার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তার বর না হয়েও সে মহিলার নৈকট্য পায় এবং সে মহিলার শ্লীলতার অবমাননার অভিপ্রায় নিয়ে এই জাতীয় মহিলাকে প্ররোচিত করে বা হুমকি দেয়। তার কারাদণ্ড বেড়ে তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং জরিমানাও ধার্য করা হতে পারে।[৪]

আইনের মাধ্যমে নারীর উপর সংগঠিত হওয়া অত্যাচারের প্রতিকার ও প্রতিরোধার্থে 'ইণ্ডিয়ান পিনাল কোড'-এর এইসব গুরুত্বপূর্ণ ধারা থাকলেও ধর্ষণের মাত্রা কমেনি। '৩৭৫' নং ধারায় ধর্ষণের সংজ্ঞা সম্পর্কে যে বিষয়গুলি বলা হয়েছে তা প্রমাণ করতে গিয়ে একজন নারীকে অথবা তার বাড়ির মানুষকে ভয়ংকর দুরাবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, ধর্ষণের ক্ষেত্রে বলা হয় এটা রাজ্যের অসম্মানের বিষয়; তাই সুনির্দিষ্টভাবে পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কেস্ লিখলে সুবিচার পাওয়ার কাজটি অনেক সহজ। আসলে বাড়ির সদস্যরা এরকম একটি আতঙ্কিত মুহূর্তে বাকরুদ্ধ হয়ে যায় বলেই, প্রাথমিক ভাবে পুলিশের কাছে গিয়ে সবিস্তারে কিছু বলতে পারেন না। তাছাড়া যেখানে ঘটনাটি ঘটে সেখানকার তথ্য প্রমাণ লোপাট করে দেওয়ার বিষয়টিও এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ধর্ষিতা নারী দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার পর নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, অনেক ক্ষেত্রেই তার মৃত্যু ঘটে। একজন নারীর জীবনে এভাবেই পটভূমির পরিবর্তন হতে পারে। এই মর্মস্পর্শী ঘটনাকে নিজের লেখা 'প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে' উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন মহাশ্বেতা দেবী।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র উপ-শহরের অধ্যাপক দম্পতির ছোট মেয়ে পুতলি ওরফে পল্লবী চৌধুরী। তার ওপরে আরও একজন দিদি ও দাদা আছে। তারাও প্রতিষ্ঠিত এবং উভয়ই বাইরে থাকে। মা-বাবার আদরের দুলালী পুতলি তার নিজের বাড়ি, শহর, এখানকার মানুষজন, বন্ধুবান্ধব, সকলকে ভীষণ ভালোবাসে। পুতলি অল্পতেই খুশি, সমাজসেবায় ব্রতী, তার বন্ধুরা সকলেই মানুষের সেবাধর্মে আত্মনিয়োজিত। অল্প বয়স হলেও পুতলির মধ্যে কোনও উচ্চাশা ছিল না। পাশের পাড়ার ছেলে সমুর সঙ্গে সুমধুর বন্ধুত্ব একদা বিবাহের পরিণতি পেতে পারে তা পুতলি জানত। এই শহরেই পুতলির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তার মা-বাবার কলেজের বন্ধু সুজাতার। সুজাতাদির কর্মকাণ্ড আরও বড় এবং ব্যাপক। 'পরিবেশদূষণ প্রতিরোধ' নামে তার একটা সংগঠন আছে। নানা ধরনের বিজ্ঞান-চেতনামূলক, নাগরিক-চেতনামূলক কাজকর্ম তারা করে। সুজাতার সমাজসেবার সু-সংগঠিত আড্ডায় অনেক ছেলেমেয়েরা আসে। নিজে ভীষণ ভালো মানুষ সুজাতাদি, উপরন্তু তার একটা বিশাল বাগান বাড়ি আছে, অনেকটা পুরনো জমিদারের মতো। পুতলির পরিচয় পাওয়ার পর সুজাতাদি তাকে একেবারেই আপন করে নিলেন। অবিবাহিত মানবপ্রেমী সুজাতাদির সঙ্গে পুতলির সম্পর্ক আরও গাঢ় হয়ে উঠল। সুজাতাদির বাড়িতে সব বন্ধুরা একসঙ্গে যেত এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করত, কি ভাবে সামাজিক কু-সংস্কারগুলি দূর করে মানুষের কাজে নিযুক্ত থাকা যায়। বন্ধুরা খুব উদ্যোগী এবং খুশি খুশি থাকত যেন একটা সুন্দর পারিপার্শ্বিকতাকে তারা লালন করে চলছিল নিজেদের অন্তরে। চারিদিকে খুশির আবহাওয়া, পুতলির মা-বাবার জীবনেও অনিমেষ শান্তি, কারণ দুজনেই বড় চাকরি করে সুন্দর একটা বাগানবাড়ি করে নিয়েছে, বড় ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। একমাত্র উনিশ বছরের শিক্ষাব্রতী মেয়ে পুতলি থাকে তাদের কাছে, তাদের বাড়ির নাম পূর্বাশা—

> "ভীষণ, ভীষণ দুর্বলতা নীহার আর অশ্রুকণার 'পূর্বাশা' বিষয়ে। ওটা যেন বাড়ি নয়, তার চেয়েও বড় কিছু। ওঁদের রুচি, ওঁদের বিশ্বাস, সব কিছুর মূর্ত প্রতীক।"[৫]

পাশেই সুজাতাদের বিশাল বাগানবাড়িতে এখন সুজাতা একাই থাকে ওর বৃদ্ধ মাকে নিয়ে। সুজাতাদির প্রায় ষাট বছর বয়স হলেও ভীষণ উদ্যোগী একটি নারী। অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ভালো মিশতে পারে। এরই মধ্যে তার মা হঠাৎ প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়লে সুজাতা অশ্রুকণার বাসায় এসে পুতলিকে একদিনের জন্য তার কাছে পাঠানোর কথা বলে। অশ্রুকণা রাজি হয়ে পুতলিকে যেতে বলে, নীহার ফিরে এলে তাকে বিষয়টা বলে, দুজনে বেশ সুখী ও আরামদায়ক সময় উপভোগ করে। উভয়ের মধ্যে দাম্পত্যের ফুরফুরে কথোপকথন হয়—

"—সুজাতা এমনিতে আসে না যায় না, কিন্তু তোমার অসুখে, আমার অপারেশনে যথেষ্ট করেছে।
—হ্যাঁ, একটা পাবলিক স্পিরিট আছে।
—ওদের ক্লাবের ছেলেমেয়েগুলোও ভাল।
—ভালই তো। আজ তাহলে আমি আর তুমি!"[৬]

আকাশে বৃষ্টি নামে, একটা সাধারণ রাত কেটে অনেকক্ষণ বৃষ্টি হওয়ার পর থেমে যায়। ততক্ষণে অশ্রুকণা খবর পায় সুজাতার মা মারা গেছে। এদিকে দুপুরে সব বন্ধুরা মিলে সুজাতাদির মাকে শ্মশানের নিয়ে যাওয়ার পর পুতলি বাড়ি ফিরে আসার জন্য একা একা বেরিয়ে পড়ে। সন্ধ্যা নামার মুখে চওড়া রাস্তাটায় ওঠার আগে নির্মীয়মান ফ্ল্যাটের পাশে হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে যায়। পুতলির পাশে একটা বড় গাড়ি এসে চোখে টর্চ মারে, মুখে ক্লোরোফর্ম দিয়ে কয়েকটা দস্যুর মতো ছেলে তাকে জোর করে গাড়িতে তুলে নেয়। পুতলি সেই দিন রাতে আর বাড়ি ফেরে না, পরপর চার দিন সে ফেরে না। অবশেষে একেবারে বিবস্ত্র অবস্থায় শহরের বাইরে নদীর ওপারে একটা কালভার্টের পাশে তার নগ্ন দেহ পাওয়া যায়, পুতলি ধর্ষিতা হয় নৃশংসভাবে। গণধর্ষণের পর পুতলি জীবন্মৃত এক নির্বাক শরীর মাত্র, হাসপাতালে নিরুপায় পড়ে আছে। এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে মা অশ্রুকণা মারা যায়। সুজাতার জীবনটাও টালমাটাল হয়ে ওঠে। একদিকে মায়ের মৃত্যু অন্যদিকে কন্যাসম পুতলির এই দুরবস্থা! সকলের জীবন কেমন মুহূর্তে বদলে যায়। নীহার হয়ে পড়ে নির্বাক ও অসহায় একজন মানুষ। অথচ, এই কয়েক মুহূর্ত পূর্বেই তার ও অশ্রুকণার একটি নিশ্চিন্ত সুরক্ষিত জীবন ছিল—

"আসলে কোনো আঘাত আসেনি জীবনে, পূর্বাশার ভেতরে ঢুকে গেলেই নিজেদের ভীষণ সুরক্ষিত মনে হতো। পুতলির বা সমুর উচ্চাশা নেই। ওরা এ—ওকে বিয়ে করবে, এর চেয়ে বড় দুঃখ ওঁরা পাননি। সুরক্ষিত, সুছন্দ, নিয়মবাঁধা জীবনযাত্রা।
হঠাৎ তাঁরা যেন নগ্ন, জনতার চোখের সামনে।"[৭]

পুতলির দাদা দিল্লি থেকে চলে এসেছে তার দিদিও এখানে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু নীহার মনে মনে মারাত্মক উদ্বেগতাড়িত হয়ে পুলিশকে আসামীদের ধরার কথা বললে পুলিশ অফিসারের যুক্তি—

"আপনি শোকাহত, আর এরকম ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হলো...আপনি জানেন না, ধর্ষণের কেস করতে পারে পুলিশ, কেন না ধর্ষণ হলো স্টেটের বিরুদ্ধে অপরাধ।"[৮]

সব থেকে আশ্চর্য হতে হয়, এত ভালো ও শিক্ষিত সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার সম্পন্ন মেয়েটার ওপর ঘটা সদ্য অত্যাচারের মর্মবেদনা ভুলে মানুষ তার চরিত্র, মেলামেশা, ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে লাগল। এইসব কথা শুনে পুতলির সমবয়সী বন্ধুরা বাজারে প্রবল তর্ক করে তাদের অমানুষ পর্যন্ত বলে দেয়। কিন্তু, সুজাতার ভাতৃসম নিশীথ সত্যি কথাটা সবার সামনে প্রকাশ করে—

"নিশীথ বলে, এটা কি বললেন ভাই? রেপ কেসে সমাজ তাই ভাবে, পুলিশ তাই ভাবে, এমনকি বিচারকরাও তাই ভাবে।"[৯]

মুহূর্তে কিভাবে বদলে যায় মানুষের জীবন, তার একটু জলজ্যান্ত নিদর্শন এই উপন্যাসটি। পুতলির হবু জীবনসঙ্গী সমু প্রায় পাগলের মতো হয়ে পড়ে, পুতলির দাদা দিদিরা এই অবস্থাতেও নিজেদের লাভ লোকসান নিয়ে চিন্তা করে—বাবা ও পুতলি কার কাছে থাকবে, পূর্বাশা বাড়িটা কবে বিক্রি করে দেবে এইসব। নীহার নিশ্চুপ হয়ে কেবল ধর্মগ্রন্থ পড়ে, একমাত্র সুজাতাদি নিজেকে দায়ী করে নতুন দায়িত্বের অনুসন্ধানে ব্রতী হন—

"এমন তো কত মেয়ের হয়...তারপর? সকলকে তার পরিবারে শেলটার দেয় না, সমাজ ক্ষমা করে না, মেয়েটার মনে দগদগে ঘা হয়ে যায়। এ সব মেয়েরা কোথায় যায়, কি করে, সে কথা ভাবতে শেখাল পুতলি।"[১০]

অবশেষে কি হয়েছিল পুতলির? সে কি জীবনের পথে সসম্মানে ফিরতে পেরেছিল? উত্তর হল 'হ্যাঁ'। বাস্তবে এই লড়াই ভীষণ কঠিন হলেও উপন্যাস রচয়িতা প্রবল বিশ্বাস থেকে নারীর ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছেন। সুজাতাদি ও নিশীথদার প্রচেষ্টায় পুতলিকে কলকাতার একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তর করা হয়েছিল। পুতলি সেরে ওঠার পর তার দিদি পিপলিদের বাড়িতে কয়েকদিন থেকেই বুঝে গিয়েছিল এই সমাজে তার লড়াই তার একার। বাবা

চেয়েছিলেন কোন দূরের ধর্মস্থানে তাকে নিয়ে গিয়ে রাখতে। বাড়ি বিক্রির ভাগের টাকাগুলো পুতলিকে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সবকিছুকে অস্বীকার করে পুতলির নবজন্ম হল। অবশ্যই পুতলির জীবনবাদী চেতনার জাগরণে সাহায্যের হাত সবচেয়ে বেশি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সুজাতাদি ও নিশীথদা। তা সত্ত্বেও পুরনো প্রেম আর সম্পর্কগুলোকে পরিত্যাগ করে নতুন পথে পা বাড়ানোর সৎ সাহস পুতলি চরিত্রকে অনন্যতা দান করেছে। সমুর প্রতি পুতলির চিঠি—

> "বাবা আমাকে ধর্মাশ্রমে রেখে দিতে চায়, যেন আমি পাপী, প্রায়শ্চিত্ত করব। দিদি আর দাদা আমাকে কাছে রাখতে হবে ভাবলেও অস্বস্তিতে পড়ে। ওরা কেউ মন থেকে আমাকে সহজ, স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারে না। কেউ একবারও বলল না, রেপড হয়েছিল? তাতে কি? মাথা তুলে বেঁচে দেখিয়ে দে যে, ধর্ষিতা মেয়েটির মাথা তুলে বাঁচার অধিকার আছে।"[১১]

সুজাতা ও নিশীথের হাত ধরে পুতলির জীবনে আবার পরিবর্তন হল। নিশীথ পুতলির জন্য বারুইপুরে 'উইন' নামক সংস্থায় একটি কাজ জোগাড় করে দেয়। এই সংস্থার আদর্শ 'ফর উইমেন ইন নীড' অর্থাৎ জেলে যে মেয়েরা দশ বছর ধরে বিনা কারণে বন্দী জীবন যাপন করছিল তাদের থাকার জন্য মিসেস সুশীলা দত্ত একটি বাড়ি দেয়। সেখানেই পুতলির কাজ হল তাদের সঙ্গে মিশে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানো। কাজটা চ্যালেঞ্জের হলেও নিশীথের কথায় সে রাজি হয়ে গেল—

> "—কাজ চেয়েছিলে, কঠিন কাজেই দিচ্ছি, তোমার চেয়ে অনেক দুর্ভাগা ওই মেয়েরা। তাদের মনে বাঁচার আশা জাগিয়ে তোলার কাজ।"[১২]

আজ যে উইন চালাচ্ছে পল্লবী ওরফে পুতলি সেই সংগঠনটা অনেক আগে মিসেস সুশীলা দত্ত গড়েছিলেন। বাড়ি ও জমি তাঁরই দান। মিসেস দত্তের মেয়ে অনীতা বিয়ের পরেই মারা যায়। ওঁর স্বামী নতুন জামাই ও মেয়েকে নিয়ে ফিরছিলেন গাড়ী চালিয়ে। দুর্ঘটনায় অনীতা এবং তার স্বামী দুজনেই মারা যাওয়ার পরে জামাই বেঁচে যায় ও বছর চারেক বাদে পুনরায় বিয়ে করে। মিসেস দত্ত মেয়েদের কল্যাণকারী কয়েকটি জায়গায় অনেক দিয়েছেন। শেষে তাঁর পিতৃপুরুষদের গ্রাম মেটেলিতে 'উইন' গড়ে দিলেন। তাঁর দান এক লক্ষ টাকা নিয়েই কাজ শুরু হল। তারপর সংস্থার রেজিস্ট্রি এবং ফাণ্ড সংগ্রহ করা হল। এখানেও দেখা গেল মিসেস দত্তের জীবন মুহূর্তেই বদলে গেল।

'উইন' নামক সংগঠনে বাঙালি মেয়ে রুচিরা মেহতা সমস্ত কিছুর ইন-চার্জ রূপে নিযুক্ত হল। সোসিওলজিতে এম. এ করেছে, স্বামীকে ডিভোর্স করে চলে এসেছে, নিজের মেয়েকে পর্যন্ত আনতে পারেনি; কারণ কাস্টডি পায়নি। তারও জীবন মুহূর্তে বদলে গেছে। তবুও নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রেখে কঠোর হাতে সেই সংগঠনটা চালিয়ে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্যকর্মী মাধবী আর গৌরী দুজনেই স্বামী পরিত্যক্তা। গৌরীর একটা ছেলেও আছে। খালপাড় কলোনির রেপ ভিকটিম ওরা। বাড়িতে ওদের আর থাকতে দেয়নি। এখানে রান্নাবান্নার দায়িত্ব পালন করে বাসন্তীর মা। বকফুলিয়াতে বাসন্তী ধর্ষিত হয়, রেপের ফলে পনের বছরে বাসন্তী সন্তানসম্ভবা হয়। বাসন্তীর মা-বাবা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে আসে। পুলিশ আসামীদের চিনলেও কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। তারপর বাসন্তীর সন্তান হলে মা-মেয়ে বাচ্ছা নিয়ে রেললাইনে আত্মহত্যা করতে যায়, স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে সংগঠনে দিয়ে যায়।

এখানে দশটি মেয়ের দেখাশোনার দায়িত্ব পড়েছে পল্লবীর ওপর। তাদের দশ জন দশ রকমের পরিস্থিতির শিকার। পুলিশ এদেরকে আদালতে নিয়ে যায়, আদালত সঠিক প্রমাণাভাবে জেলে পাঠায়। আইন অনুযায়ী, ওদের এক মাসের বেশি জেলে রাখা আইন বিরুদ্ধ। কিন্তু জেলে নিয়ে যাওয়ার পর ওদের কথা সবাই ভুলে যায়। এইরকম মেয়েদের উদ্ধার করে এনে নতুন জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার কাজে সর্বতোভাবে সফল হয় পল্লবী। এখন টিভিতে খবরের কাগজে পল্লবীর লড়াইয়ের কথা প্রায়শই প্রকাশ পায়। নিজের জীবনচক্রের পরিবর্তনকে খুবই উপলব্ধি করে পল্লবী। সমুর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্বাভাবিক রেখেই তার বিয়ে করার জন্য বিশেষভাবে অভিনন্দন জানায়। নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলে—

> "বাবা, দাদা, দিদি, সবাই খুব গর্বিত এখন আমার জন্যে। আমি তো জানি, কাগজে এত লেখালেখি না হলে ওরা এমন উচ্ছ্বসিত হতো না।...

এখানে যাদের মধ্যে আছি, তাদের জীবন এমনই ভাঙাচোরা যে, নিজের কথা ভাবার সময়ই পাইনি। ওদের কথা জানার পর আর নিজের দুঃখ বা ক্ষতিকে বড় মনে হয় না। অনেক, অনেক মেয়ে আমার চেয়েও লাঞ্ছিত সমু, তাদের আমি জানিও না। কিন্তু এটা জানি যে, আমার মতো মেয়েরা অনেক। আমি তাদের একজন। হয়তো চরম সৌভাগ্যবতী একজন। আমাকে তো মুখ লুকিয়ে বেড়াতে হয়নি। আমি আরো বড় একটা কাজের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি।"[১৩]

পুতলি থেকে পল্লবী হওয়ার পথে অনেক বড় বড় বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। তবে সমস্ত কিছুই এত দ্রুত এবং অতর্কিতে হয়ে যাওয়ার পর নিজের ছোট্ট পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে পুতলি বৃহত্তর সংগ্রামের জীবনে লিপ্ত হয়েছে। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হওয়ার পর সে অসংখ্য মানুষের জীবনের নির্মম পরিণতিকে উপলব্ধি করেছে। পল্লবী বুঝেছে মেয়েদের জীবনে পুরুষের যৌনলালসার প্রভাব হঠাৎ করে বদলে দেয় তাদের সমস্ত কিছু অবস্থানকে। এই উপন্যাসটি লেখার নেপথ্যে মহাশ্বেতা দেবীর নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা কিংবা মানবাধিকার কর্মী রূপে কাজের সূত্রগুলি বিশেষভাবে সক্রিয় থেকেছে। উপন্যাসটির ভূমিকা অংশে প্রথমেই নারীদের প্রতি সংঘটিত অপরাধের প্রামাণ্য খতিয়ান ন্যাশনাল ক্রাইম রিসার্চ ব্যুরোর (১৯৯১) রিপোর্ট অনুসারে দিয়েছেন লেখক। সেখানে স্পষ্ট করেই তিনি বলেছেন—

"ভারতবর্ষে প্রতি ৫৪ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হয়, অর্থাৎ দৈনিক ২৭ জন। পণের জন্য বধূহত্যা প্রতি দুঘণ্টায় একটি, অর্থাৎ দৈনিক ১২ জন। আমরা, ভারতীয়রা, শুধু ধর্ষণ ও বধূহত্যা করি না। প্রতি ৪৩ মিনিটে একটি নারীকে অপহরণ করি, প্রতি তেত্রিশ মিনিটে একজনকে নিষ্ঠুর নির্যাতন করি। প্রতি বাহান্ন মিনিটে একটি মেয়েকে ঈভটিজিং করি।"[১৪]

বিশেষত মেয়েদের সঙ্গে ঘটে চলা গার্হ্যস্থ ও পারিপার্শ্বিক পাশবিকতার সর্বোচ্চ পরিণতি— ধর্ষণের কারণ কিংবা ফলাফলকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে 'প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে' উপন্যাসে নারী শক্তির জয়গাথা রচনা করেছেন মহাশ্বেতা দেবী। নিবিড় বাস্তবনিষ্ঠ বাচনভঙ্গি ও ঘটনার যথাযথ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র আমাদের বর্তমান সমাজ জীবনের দলিল হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি সৃষ্টিশীল প্রকৃতির মতোই নারীর ধ্বংস ও পুনরুত্থানের ইতিকথার অনুরণন তার মর্যাদাকে স্বমহিমায় উজ্জ্বল করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র:

১. দাশ, ড. নির্মল। চর্যাগীতি পরিক্রমা। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭, কলকাতা, পৃ. ১২৬।
২. নাসরিন, তসলিমা। নির্বাচিত কবিতা। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৬৪।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, ড. মানবেন্দু। মনুসংহিতা। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১০, কলকাতা, পৃ. ৪০০।
৪. চক্রবর্তী, সুতপা। নারী নির্যাতন এবং ভারতীয় আইন: সমাজ ও কথাসাহিত্যের নিরিখে একটি সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন। গবেষণা সন্দর্ভ, ২০১৬, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১২১-১৩০।
৫. দেবী, মহাশ্বেতা। প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে। করুণা প্রকাশনী, ২০০৪, কলকাতা, পৃ. ১৯।
৬. তদেব, পৃ. ৩৫।
৭. তদেব, পৃ. ৪৯।
৮. তদেব, পৃ. ৫১।
৯. তদেব, পৃ. ৫৩।
১০. তদেব, পৃ. ৫৬।
১১. তদেব, পৃ. ৮০।
১২. তদেব, পৃ. ৮৮।
১৩. তদেব, পৃ. ৯২।
১৪. তদেব, ভূমিকা।